'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ' গ্রন্থের অনুবাদ

নবিয়ে রহমত



মূল

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি ﵀

অনুবাদ

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৯

জাহিলি যুগের হালচাল ৩১

☑ জাহিলি যুগের ধর্মীয় অবস্থা ৩১

ইহুদি ধর্ম ৩১

খ্রিষ্টধর্ম ৩২

মাজুস ৩৪

বৌদ্ধ ধর্ম ৩৫

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ৩৫

আরবদের অজ্ঞতার যুগ ৩৭

☑ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেশ ও জাতির চিত্র ৩৭

প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য ৩৮

পারস্যের সাসানী সাম্রাজ্য ৩৯

হিন্দুস্তান ৪২

ইউরোপ ৪৫

জাযিরাতুল আরব ৪৬

☑ জাহিলি যুগের সাধারণ চিত্র ৫০

☑ নবিজিকে জাযিরাতুল আরবে প্রেরণের কারণ ৫১

☑ নবুওয়াতের পূর্বে জাযিরাতুল আরব ৬৮

সীমানা ৬৮

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনগণ ৬৯

সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ ৭০

আরবদের শ্রেণিবিন্যাস ৭১
ভাষাগত ঐক্য ৭২
☑ জাযিরাতুল আরব : জাতি ও ধর্মের ইতিহাস ৭৩
ইসমাঈল যখন মক্কায় ৭৬
কুরাইশ গোত্র ৭৯
কুসাই ইবনু কিলাব-এর বংশধর ৭৯
বনী হাশিম ৮০
মক্কায় পৌত্তলিকতার ইতিহাস ৮০
আসহাবে ফিলের ঘটনা ৮৩
কাবার ব্যাপারে কুরাইশদের বিশ্বাস ৮৪
হাতির ঘটনা এবং এর তাৎপর্য ৮৬
☑ ইসলাম আবির্ভাবের সময় মক্কার অবস্থা ৮৭
মক্কা ছিল নগরী ৮৭
নতুন ঘাঁটি ৮৯
সংগঠন, পদ ও দায়িত্ব ৯০
বাণিজ্যিক তৎপরতা ৯১
অর্থনীতি, মুদ্রা ও পরিমাপ পদ্ধতি ৯২
কুরাইশদের ধনিক শ্রেণি ৯৩
শিল্পকলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ৯৪
যুদ্ধকৌশল ৯৫
মক্কা: আধ্যাত্মিক ও সামাজিক রাজধানী ৯৬
নৈতিক অবস্থান ৯৬
ধর্মীয় অবস্থান ৯৬

ঙ জন্ম থেকে নবুওয়াত ৯৯

☑ আবদুল্লাহ ও আমিনা ৯৯
☑ জন্ম ও বংশধারা ৯৯

☑ নতুন বিশ্বের জন্ম ১০০
☑ দুধপান এবং বক্ষ-বিদারণ ১০১
☑ মা ও দাদার মৃত্যু এবং চাচার আশ্রয়ে ১০৩
☑ পাদরি বুহায়রার ঘটনা ১০৪
☑ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একটি উদ্ভট উদাহরণ ১০৬
☑ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ শিক্ষা ও পরিচর্যা ১০৯
☑ খাদিজার সাথে বিবাহ ১১০
☑ কাবা পুনঃনির্মাণ এবং বিরোধ মীমাংসা ১১১
☑ হিলফুল ফুযুল ১১২
☑ অজানা উদ্বেগ এবং নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ১১৪

ঞ নবুওয়াত থেকে হিজরত ১১৬

☑ সুখ পায়রার আগমন ১১৬
☑ নবুওয়াত লাভ ১১৭
☑ খাদিজার ঘর ১১৮
☑ ইসলাম-গ্রহণের ধারা ১১৯
☑ সত্যের প্রথম ঘোষণা সাফা পর্বতে ১২১
☑ দাওয়াত ও তালিমের প্রগাঢ় জ্ঞান ১২২
☑ আবু তালিবের সহানুভূতি ও কুরাইশের শত্রুতা ১২৩
☑ সাহাবিদের ওপর দুঃসহ নির্যাতন ১২৪
☑ রাসূলের বিরুদ্ধে শত্রুতা ১২৭
☑ আবু বকরের সাথে কুরাইশদের ব্যবহার ১২৮
☑ কুরাইশদের ভ্রান্তি ও অত্যাচার ১২৯
☑ হামযার ইসলাম গ্রহণ ১৩০
☑ নবিজির সাথে উতবার কথোপকথন ১৩১
☑ হাবশায় মুসলমানদের হিজরত ১৩২
☑ কুরাইশদের পিছু ধাওয়া ১৩৩

☑ উমরের ইসলাম গ্রহণ..... ১৩৬
☑ বনী হাশিমকে বয়কট ও অবরোধ ১৩৯
☑ আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু.....১৪০
☑ কুরআনের প্রভাব ১৪০
☑ তায়েফে গমন ও সেখানকার নির্যাতন ১৪২
☑ ইসরা ও মিরাজ.....১৪৬
☑ মিরাজের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ১৪৭
☑ বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচার ১৪৯
☑ ইসলামের পথ ১৪৯

❖ মদীনার দিকে হিজরত.....১৫২

☑ আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা ১৫২
আকাবার প্রথম বাইয়াত.....১৫৩
আনসারদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তুতির কারণ ১৫৩
মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত ১৫৬
মদীনায় ইসলামের প্রসার..... ১৫৭
আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত.....১৫৮
☑ সাহাবিদের মদীনায় হিজরত.....১৫৮
☑ নবিজির হিজরত ১৬১
বিপরীত দৃশ্যপট..... ১৬২
হিজরত থেকে একটি শিক্ষা.....১৬৩
গারে সাওর অভিমুখে ১৬৩
ভালোবাসার অপূর্বতা..... ১৬৪
স্পর্শকাতর মুহূর্ত..... ১৬৪
বস্তুবাদী মনন যা মেনে নিতে পারে না.....১৬৬
মুবারক ব্যক্তি..... ১৬৭

❖ হিজরতের সময়ে মদীনার সমাজচিত্র.....১৬৯

☑ মক্কা ও মদীনার সামাজিক পার্থক্য.....১৬৯
☑ ইহুদিদের অবস্থান.....১৬৯
ইয়াসরিবে ইহুদিদের গোত্র.....১৭০
ইহুদিদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক দিক.....১৭২
☑ আওস ও খাযরাজ গোত্র.....১৭৬
☑ প্রাকৃতিক অবস্থা.....১৭৭
☑ ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা.....১৭৯
☑ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা.....১৮১
☑ জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন.....১৮৪

ঞ্চ মদীনার প্রাথমিক দিনগুলি ১৮৫

☑ আনসারদের আবেগময় অভ্যর্থনা.....১৮৫
☑ মসজিদে কুবা ও মদীনার প্রথম জুমুআ.....১৮৬
☑ আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে.....১৮৭
☑ মদীনাকে ঘিরে নানান কার্যক্রম.....১৮৮
মসজিদে নববি নির্মাণ.....১৮৮
মদীনার নতুন নামকরণ.....১৮৯
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন.....১৮৯
চুক্তি সম্পাদন.....১৯০
আযান প্রচলন.....১৯০
☑ মদীনায় নিফাক ও মুনাফিকদের উত্থান.....১৯১
☑ ইহুদিদের ইসলাম-বিরোধিতা.....১৯২
☑ কিবলা পরিবর্তন.....১৯৫
☑ মদীনার মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশদের সংঘর্ষ.....১৯৬
☑ যুদ্ধের অনুমতি.....১৯৭
সারিয়া আবদুল্লাহ বিন জাহশ.....১৯৭
গাযওয়াতুল আবওয়া.....২০০

☑ রোজা ফরজ হওয়া ২০০

ঞ্চ বদরের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২০১

☑ বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ২০১
☑ আনসারদের প্রতিক্রিয়া এবং আনুগত্য ২০৩
☑ শাহাদাতের প্রতি নাবালেগদের আগ্রহ.....২০৪
☑ সংখ্যা ও শক্তির পার্থক্য ২০৪
☑ পরামর্শ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি..... ২০৫
☑ নবিজির নেতৃত্বের প্রতিভা ২০৬
☑ যুদ্ধের প্রস্তুতি..... ২০৬
☑ কুরাইশদের আগমন.....২০৭
☑ দুআ ও আল্লাহর প্রতি সমর্পণ.....২০৭
☑ যুদ্ধের শুরু..... ২০৮
☑ শাহাদাতের প্রতিযোগিতা ২১০
☑ সুস্পষ্ট বিজয় ২১০
☑ বদর যুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল..... ২১১
☑ সবার ওপরে ঈমান..... ২১২
☑ বন্দিদের ব্যাপারে মুসলিমদের আচরণ..... ২১২
☑ শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি.....২১৩
☑ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অভিযান.....২১৩
☑ বনু কায়নুকার নির্বাসন..... ২১৪
☑ কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা ২১৫

ঞ্চ উহুদের যুদ্ধ.....২১৬

☑ জাহিলি অহংকার ও প্রতিশোধের আগুন.....২১৬
☑ উহুদের ময়দানে ২১৭
☑ সমবয়সিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ২১৮
☑ যুদ্ধের সূচনা.....২১৮

☑ হামযা এবং মুসআবের শাহাদাত..... ২১৯
☑ প্রাথমিক বিজয় ২১৯
☑ মুসলিমদের ওপর বিপর্যয় ২২০
☑ ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের অমর দৃষ্টান্ত ২২২
কেন্দ্রস্থলে ফিরে আসা ২২৫
মুমিন নারীর ধৈর্য..... ২২৭
শহীদদের দাফন..... ২২৭
মহিলা সাহাবিদের আত্মত্যাগ ২২৮
মুসলিমদের আত্মত্যাগ..... ২২৮
☑ মুসলিমদের আত্মশুদ্ধি ২২৯
☑ বনু রাজীর ঘটনা..... ২৩০
☑ বীরে মাউনার ঘটনা ২৩২
☑ বনু নাদিরের নির্বাসন..... ২৩৩
☑ গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা ২৩৪
☑ সংঘর্ষবিহীন যুদ্ধাভিযান ২৩৫

❖ খন্দকের যুদ্ধ ২৩৬

☑ হিকমত : মুমিনদের হারানো সম্পদ ২৩৭
☑ মুসলিমদের মধ্যে সহানুভূতির চেতনা..... ২৩৮
☑ কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামি বিজয়ের আলো ২৩৮
☑ যুদ্ধের সময় নবিজির কিছু মুজিযা ২৩৯
☑ হাজার হাজার সেনা ২৪০
☑ কাফির ও মুসলিম বীরের শক্তি যাচাই..... ২৪১
☑ শাহাদাতের জন্য মায়ের অনুপ্রেরণা দান..... ২৪২
☑ আসমান-জমিনের বাহিনী আল্লাহরই ২৪৩

❖ বনু কুরায়যার যুদ্ধ..... ২৪৬

☑ চুক্তিভঙ্গ.....২৪৬

☑ বনু কুরায়যা অভিমুখে যাত্রা ২৪৭
☑ আল্লাহর পথে অবিচল ২৪৯
☑ সংগতিপূর্ণ শাস্তি ২৫০
☑ ঈমানের আলোয় পাল্টে গেলেন ২৫২

❖ বনু মুসতালিকের যুদ্ধ ২৫৪

☑ যুদ্ধের বিবরণ ২৫৪
☑ যুদ্ধ শেষে ২৫৫
☑ মিথ্যা অপবাদের ঘটনা (ইফক) ২৫৬

❖ হুদাইবিয়ার সন্ধি ২৬০

☑ স্বপ্ন এবং প্রস্তুতি ২৬০
☑ দীর্ঘ বিরতির পর মক্কায় ২৬১
☑ কুরাইশদের আতঙ্ক ২৬১
☑ বাইয়াতে রিদওয়ান ২৬২
☑ মধ্যস্থতা ও আলোচনা ২৬৩
☑ সন্ধিচুক্তি ২৬৪
☑ মুসলিমদের পরীক্ষা এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন ২৬৬
☑ মহাবিজয় ২৬৮
☑ খালিদ ও আমর ইবনুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ ২৭০

❖ রাজা-বাদশাহদের প্রতি দাওয়াত ২৭১

☑ প্রজ্ঞাদীপ্ত আহ্বান ২৭১
☑ ইসলামের দাওয়াতনামা ২৭২
☑ রাজা-বাদশাহদের পরিচয় ২৭৫
হিরাক্লিয়াস: বাইজেন্টাইন সম্রাট (৬১০-৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ) ২৭৫
দ্বিতীয় খসরু পারভেজ (৫৯০-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৭৭
মুকাওকিস ২৭৮

নাজাশি ২৮০
☑ প্রেরিত পত্রের সঙ্গে রাজা-বাদশাহদের আচরণ ২৮১
হিরাক্লিয়াস এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে আলোচনা ২৮২
আরিসীয়রা কারা ২৮৫
আরব শাসকদের কাছে পত্র ২৮৮
☑ বনী লিহইয়ান এবং যি-কারদের যুদ্ধ ২৮৯

ঙ্ক খাইবার যুদ্ধ ২৯০

☑ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ২৯০
☑ খাইবার : বিজয়ের প্রথম দরজা ২৯০
☑ নবিজির নেতৃত্বে মুমিন বাহিনী ২৯১
☑ একের পর এক দুর্গ বিজয় ২৯২
☑ এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসের ঈমান ২৯৩
☑ খাইবারে থাকার শর্ত ২৯৫
☑ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উদাহরণ ২৯৫
☑ ইহুদিদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ২৯৬
☑ খাইবার যুদ্ধের প্রভাব ২৯৭
বিজয় ও গনিমত লাভ ২৯৭
তায়মার ইহুদিদের আত্মসমর্পণ ২৯৮
☑ মুহাজিরদের আত্মমর্যাদা ২৯৮
☑ খাইবার-পরবর্তী অভিযান ২৯৯
☑ উমরায়ে কাযা ২৯৯
☑ ইসলামের প্রভাবে মন-মানসিকতার পরিবর্তন ২৯৯

ঙ্ক মুতার যুদ্ধ ৩০১

☑ মুসলিম দূতের হত্যাকাণ্ড ও এর প্রতিক্রিয়া ৩০১
☑ রোমের মাটিতে প্রথম অভিযান ৩০১
☑ শত্রুর বিশাল বাহিনীর সংবাদ ৩০২

☑ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ৩০২
☑ জীবনপণ যুদ্ধ ও সাহসী লড়াই ৩০২
☑ খালিদ ইবনু ওয়ালিদের কৌশলী নেতৃত্ব ৩০৩
☑ বাস্তব পর্যবেক্ষণ ৩০৪
☑ দুটি ডানার অধিকারী ৩০৪
☑ সাহাবিদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৩০৫
☑ মুতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি কিছু অভিযান ৩০৬

ঙ মক্কা বিজয় ৩০৭

☑ মক্কা বিজয়ের পটভূমি ৩০৭
বনী বাকর ও কুরাইশদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ৩০৭
যাত্রার প্রস্তুতি এবং হাতিবের চিঠি ৩১০
☑ অন্যায়কারীকে ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত ৩১১
☑ আবু সুফিয়ান ইবনু হারবের উপস্থিতি ৩১২
☑ সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষণা ৩১৩
☑ বিনীতচিত্তে প্রবেশ ৩১৪
☑ পবিত্র কাবাঘর থেকে মূর্তির অপসারণ ৩১৬
☑ কোনো পক্ষপাত নেই ৩১৮
☑ শত্রুদের প্রতি ক্ষমাশীলতা ৩১৮
☑ আনসারদের সঙ্গে আলোচনা ৩২০
☑ শত্রু থেকে বন্ধুতে রূপান্তর ৩২১
☑ মূর্তি ও মিথ্যার অবসান ৩২১
☑ মক্কা বিজয়ের প্রভাব ৩২২

ঙ হুনাইনের যুদ্ধ ৩২৪

☑ হাওয়াযিনদের সমাবেশ ৩২৪
☑ মূর্তিপূজার অবসান ৩২৫
☑ হুনাইন উপত্যকায় ৩২৬

শত্রুদের আনন্দ এবং দুর্বল ঈমানদারদের বিচলিত হওয়া.....৩২৬
বিজয় এবং শান্তি.....৩২৬
☑ আওতাস উপত্যকায় যুদ্ধ ৩২৮
☑ তায়িফের যুদ্ধ ৩২৯
তায়িফ অবরোধ.....৩২৯
অবরোধ তোলার নির্দেশ ৩৩০
☑ হুনাইন ও তার গনিমত.....৩৩০
☑ আনসারের প্রতি ভালোবাসা.....৩৩০
☑ বন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়া..... ৩৩১
☑ দয়া ও দানশীলতায় উদারতা..... ৩৩২
☑ 'জিরানা' থেকে উমরা.....৩৩৩
☑ সাকিফ গোত্রের পরিণতি ৩৩৩
☑ কাব ইবনু যুহাইর-এর ইসলাম গ্রহণ.....৩৩৫

তাবুকের যুদ্ধ..... ৩৩৬

☑ পটভূমি.....৩৩৬
☑ যুদ্ধের সময়কাল ৩৩৮
☑ সাহাবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা..... ৩৩৯
☑ তাবুক অভিমুখে যাত্রা..... ৩৪০
☑ পানির অভাব এবং আল্লাহর করুণা..... ৩৪০
☑ মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৩৪১
☑ কাব ইবনু মালিকের ঘটনা.....৩৪২
☑ জিহাদের সৌন্দর্য ৩৪৯
☑ ইসলামের প্রথম হজ ৩৫১

প্রতিনিধি দলের আগমন..... ৩৫২

☑ লাগাতার ইসলাম গ্রহণ ৩৫২
☑ মূর্খ পূজারি এবং মহান শিক্ষকের সংলাপ..... ৩৫৬

☑ মূর্তিপূজার প্রভাব নির্মূল ৩৫৮

❖ বিদায় হজ ৩৫৯

☑ বিদায় হজের পটভূমি ৩৫৯
☑ বিদায় হজের গুরুত্ব ও শিক্ষণীয় দিক ৩৫৯
☑ নবিজির হজযাত্রা ৩৬০
☑ হজের কার্যক্রম ৩৬২
☑ হজের খুতবা ৩৬৬

❖ শেষ বিদায়ের কাল ৩৬৯

☑ দ্বীনের পূর্ণতা এবং বিদায়-বার্তা ৩৬৯
☑ ইতিকাফ বৃদ্ধি ৩৭০
☑ নবিজির অসুস্থতার সূত্রপাত ৩৭২
☑ শেষ সামরিক অভিযান ৩৭৩
☑ মুসলিমদের জন্য সতর্কবার্তা ৩৭৪
☑ সম্পদের প্রতি অনীহা ৩৭৪
☑ আবু বকরের ইমামতি ৩৭৫
☑ বিদায়ী খুতবা ৩৭৫
☑ আনসারদের ব্যাপারে ওসিয়ত ৩৭৬
☑ নামাজরত উম্মাহর দিকে তাঁর শেষ দৃষ্টি ৩৭৭
☑ কিছু সতর্কবাণী ৩৭৭
☑ অন্তিম শয্যায় কিছু ওসিয়ত ৩৭৮
☑ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় ৩৭৯
☑ সাহাবিদের অবস্থা ৩৮০
☑ নবিজির জানাযা ও দাফন ৩৮২

❖ আহলে বাইতের সদস্যগণ ৩৮৪

☑ নবিজির পবিত্র স্ত্রীগণ ৩৮৪

☑ বহুবিবাহের পেছনে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৩৮৬
☑ নবিজির সন্তান-সন্ততি.....৩৮৯

❖ নবিজির পবিত্র আখলাক ৩৯৩

☑ পবিত্র চরিত্র ও দেহের বিবরণ.....৩৯৩
☑ দুনিয়ার প্রতি নবিজির দৃষ্টিভঙ্গি.....৩৯৮
☑ মানুষের সঙ্গে আচরণ ৪০১
☑ কবিতার প্রতি ভালোবাসা.....৪০২
☑ কোমলতা ও স্নেহশীলতা.....৪০২
☑ গোলাম ও আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা ৪০২
☑ যুদ্ধবন্দির প্রতি সহানুভূতি ৪০৩
☑ শিশুদের প্রতি ভালোবাসা.....৪০৩
☑ ভারসাম্য ও সরলতা.....৪০৫
☑ ঘরোয়া জীবন ৪০৬
☑ সংকটে নিকটজনকে অগ্রাধিকার.....৪০৭
☑ স্বাচ্ছন্দ্যে আত্মীয়দের পেছনে রাখা ৪০৮
☑ কোমল হৃদয় ও মহৎ অনুভূতি.....৪০৮
☑ উহুদের শহীদদের প্রতি নবিজির শ্রদ্ধা ৪০৯
☑ ওয়াহশির প্রতি নবিজির উদারতা.....৪১০
☑ মায়ের কবরের পাশে.....৪১০
☑ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা..... ৪১১
☑ সাহসিকতা ও লজ্জাশীলতা ৪১৫
☑ সর্বজনীন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ৪১৮

❖ নবুওয়াতের মহানুভবতা.....৪২১

☑ মানবজাতির ওপর নবিজির মহিমা ৪২১
১. ইতিহাসে এক অনন্য ঘোষণা:..... ৪২১
২. মুহাম্মাদী মিশনের দয়া.....৪২৩

৩. জাহিলি যুগের চিত্র এবং তার আত্মহননের প্রস্তুতি ৪২৭

☑ মুহাম্মাদী মিশনের অনুগ্রহ ৪৩০

১. বিশুদ্ধ একত্ববাদের স্পষ্ট ধারণা ৪৩১

২. মানবিক ঐক্য এবং সাম্যের মূলনীতি ৪৩১

৩. মানবতার মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা..... ৪৩৩

৪. মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং আশা ফিরিয়ে আনা.....৪৩৫

৫. দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে সমন্বয়.....৪৩৯

৬. মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ ৪৪২

গ্রন্থপঞ্জী ৪৪৬

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সবকিছুর মালিক। শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। তাঁর পরিবার, সাহাবি এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পথ অনুসরণ করবেন—সকলের ওপর।

নবি ﷺ-এর জীবনী এই লেখকের প্রথম শিক্ষালয়। তিনি ছোটবেলা থেকেই নবি-জীবনী পড়া শুরু করেন। সাধারণত এত অল্প বয়সে শিশুরা এটা পড়ে না। এর কারণ ছিল তাঁর পরিবারের পরিবেশ। তাঁদের ঘরে নবিজির জীবনী ছিল শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি ছোট লাইব্রেরি ছিল, যেখানে বিভিন্ন বই পাওয়া যেত। এসব বই ঘুরত হাত-থেকে-হাতে।

তাঁর বড় ভাই ড. সাইয়্যিদ আবদুল আলি হাসানি তাঁকে দিকনির্দেশনা দিতেন। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শে লেখক ছোটবেলাতেই উর্দু ভাষায় নবি-জীবনী নিয়ে লেখা সেরা কিতাবগুলো পড়ার সুযোগ পেয়ে যান। উর্দু ভাষা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবির পর এটি নবিজির জীবনীচর্চার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। এতে নবিজির জীবনী নিয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লেখা হয়েছে।[১]

এরপর লেখক যখন আরবি ভাষায় পারদর্শী হলেন, তখন নবিজির জীবনীগ্রন্থ পড়ায় তীব্র মনোযোগ দিলেন। এসব বইয়ের মধ্যে ইবন হিশামের *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ* এবং ইবনুল কায়্যিমের *যাদুল মাআদ* ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু এই বইগুলো পড়েননি। বরং বইগুলোর সঙ্গে গড়ে তোলেছেন এক গভীর সম্পর্ক। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এই বইগুলোর ঘটনা ও তথ্যের মধ্যে ডুবে ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন ঈমানের মিষ্টতা। এসব ঘটনা তাঁর হৃদয়ে বাড়িয়ে তোলে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার আবেগ।

নবি ﷺ-এর জীবনী সবসময়ই শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কুরআনের পরে এটি মানুষের মন-মস্তিষ্কে সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। এরপর তিনি প্রাচীন

[১] লেখক কিভাবে নবিজির জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং এই গ্রন্থগুলো কিভাবে তাঁর জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে তা জানতে পড়ুন الطريق إلى المدينة এর الكتاب الذي لا أنسى فضله প্রথম প্রবন্ধের শিরোনামে। এটি দারে ইবন কাসির প্রকাশনী থেকে দামেস্কে প্রকাশিত।

এবং আধুনিক জীবনীগ্রন্থগুলো পড়া শুরু করেন। যেসব বই তাঁর কাছে পৌঁছায়, সেগুলো তিনি পড়ে দেখেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন ভাষায় লেখা নবিজির সীরাতও অধ্যয়ন করেন।

দীর্ঘদিনের গভীর অধ্যয়নের ফলে সীরাতের প্রভাব লেখকের প্রতিটি লেখনীতে স্পষ্ট। তাঁর লেখাগুলোতে হাসি-কান্না, শোভা-সৌন্দর্য এবং রূপ-রস সবই সীরাত থেকে উৎসারিত। সীরাতের অনুসরণের বরকতেই তাঁর রচনাগুলো সবসময় সজীব ও প্রাণবন্ত থাকত। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতার মূল উৎস ছিল সীরাত। তিনি যেকোনো বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য সীরাতের ঘটনা থেকেই শক্তিশালী প্রমাণ এবং যুতসই উদাহরণ গ্রহণ করতেন। সীরাত তাঁর মন-মস্তিষ্কে উদ্দীপনা, প্রেরণা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করত। ঘুমন্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলত এবং সৃজনশীলতাকে দিত নতুন মাত্রা। তাই তাঁর কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা লেখায় সীরাতের গভীর প্রভাবের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায় না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর আগমনের গুরুত্ব এবং মানব সমাজে এর বিস্ময়কর প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা লেখকের গ্রন্থগুলোতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। *মদীনার পথে* বা *মদীনার কাফেলা* নামক গ্রন্থেও এসব বিষয় সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যদিও লেখক বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবু সীরাতের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার সুযোগ এখনো হয়নি। তবে তাঁর অনুভূতি ছিল প্রবল যে, সীরাত নিয়ে এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন, যা আধুনিক গবেষণার রীতিতে রচিত হবে। এই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক মৌলিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সহযোগিতা নেওয়া হবে, তবে তার ভিত্তি হবে সীরাতের প্রাচীন মৌলিক উৎসগুলো।

এ গ্রন্থ রচনায় কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তথ্যের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা হবে না। একইসঙ্গে এটি কোনো বিশ্বকোষের মতো হবে না, যেখানে যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হয়। বরং প্রতিটি বিষয় গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।

সীরাতগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অনেক লেখক যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা প্রায়শই সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পদ্ধতির কারণে এমন কিছু প্রশ্ন ও অভিযোগ সৃষ্টি হয়, যা সীরাতে নববী ﷺ-এর পবিত্রতা ও মহত্ত্বকে আড়াল করে। অথচ, সীরাত এমন একটি বিষয় যা সব ধরনের সন্দেহ ও অভিযোগ থেকে মুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের এই অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন নেই।

পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক ইতোমধ্যেই মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে সীরাতে নববী ﷺ-কে সকল প্রকার অভিযোগ ও সন্দেহ থেকে মুক্ত করেছেন।

তাই একটি সঠিক সীরাতগ্রন্থ রচনা করতে হলে এটিকে দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা অপরিহার্য।

আলোর পথে এগিয়ে যেতে আসমানি কিতাব, নবিদের জীবন এবং গায়েবী বিষয়াবলী নিয়ে সঠিক উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব উপলব্ধি ছাড়া সীরাতের গভীরতা বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে সীরাতে নববী ﷺ শুধুমাত্র একজন জাতীয় নেতার জীবনী নয়, বরং এটি একজন মহান নবির জীবনচরিত। এমন এক নবি, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী এমনই পূর্ণাঙ্গ ও অনন্য যে, কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা রঙিন ভাষার প্রয়োজন নেই। সীরাত এমনই শক্তিশালী যে, এটি একজন নিরপেক্ষ, সুশিক্ষিত মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে সহজেই প্রভাব ফেলতে পারে। চাই সে মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম।

লেখক তাঁর রচনায় সীরাতের মূল ভিত্তির ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি এমন একটি রচনা তৈরি করেছেন, যা নিজস্ব ভাষায় পাঠকের কাছে কথা বলে। এটি পাঠকের মনের গভীরে পৌঁছে নিজ থেকেই পথ নির্দেশ তৈরি করে। লেখক কোনো দার্শনিক জটিলতায় যাননি। তিনি সরাসরি সত্য ও বাস্তব ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন। সীরাত এমনই সুন্দর, মনোমুগ্ধকর এবং প্রাণবন্ত যে, এটি কোনো লেখকের সাহিত্যকর্ম বা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। তবে, একজন লেখকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো ঘটনার সঠিকতা নির্বাচন, শব্দ চয়ন এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনা। লেখার সময় আবেগ ও যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। একদিকে যেন ভক্তি ও ভালোবাসা থাকে, অন্যদিকে থাকে বুদ্ধি ও যুক্তিবোধের সংমিশ্রণ। এই ভারসাম্যের মাধ্যমেই একটি সীরাত পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে এবং তাকে আলোর পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

সীরাত নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা যেন সীরাতের প্রতি হৃদয়ের গভীর প্রেম ও আবেগকে নিস্তেজ না করে। সীরাতের সৌন্দর্য ও তা থেকে সঞ্চারিত আলো হৃদয়কে আলোকিত করে এবং সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে নেয়। এটি তখনই সম্ভব, যখন সীরাত থেকে কেউ পুরোপুরি উপকৃত হয়। সীরাতের বিধান, ঘটনাবলী, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝতে পারা এর প্রকৃত ফলাফল লাভের একমাত্র পথ।

যদি সীরাতের কোনো গ্রন্থ ভক্তি, আবেগ ও ঈমানের উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তা জীবনের স্পন্দনহীন একটি শুষ্ক কাঠামোতে পরিণত হবে। এতে থাকবে না জীবনের স্নিগ্ধতা, সিক্ততা কিংবা উষ্ণতার কোনো ছোঁয়া। আবার ভক্তি ও আবেগের অতিরিক্ত প্রাধান্য যেন সুস্থ যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির দাবিকে উপেক্ষা না করে। বর্তমান যুগে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীরাতের কোনো ব্যাখ্যা যেন

০১

জাহিলি যুগের হালচাল

জাহিলি যুগের ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন যুগের নানান ধর্ম, শাস্ত্র ও বিধিবিধান একসময় নীতি-নৈতিকতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এখন সেই রূপ আর নেই। সেসব ধর্ম আজ সুবিধাবাদী ও কূটকৌশলী মানুষের লালসার শিকার। অপবাদ ও মিথ্যাচারের হাতে বলি। অশান্তি ও সংঘাতের কারণে আদি মহিমা হারিয়ে ফেলেছে প্রাচীন ধর্মগুলো। অবস্থা এতটাই করুণ যে, আজ যদি সেসব ধর্মের প্রবর্তকরা জীবিত হয়ে ফিরে আসেন, তবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকেই চিনতে পারবেন না। বরং একে অস্বীকার করবেন।[১]

☑ ইহুদি ধর্ম

ইহুদিবাদ বর্তমানে কিছু প্রথা-সর্বস্ব আবরণে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রাণশক্তি বা প্রজ্ঞা-মণ্ডিত বিষয় নেই। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইহুদি ধর্ম একটি জাতিগত বিশ্বাসব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ। এতে বিশ্বমানবতার জন্য কোনো মহান বার্তা নেই। উপকারী নির্দেশনা বা অন্য জাতির প্রতি কোনো আহ্বান নেই। সমগ্র মানবজাতির প্রতি নেই কোনো সহমর্মিতার পয়গাম।

এই ধর্ম একসময় যে মৌলিক বিশ্বাসের জন্য গৌরব অর্জন করেছিল এবং অন্যান্য ধর্ম-জাতির মধ্যে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, তা হলো একত্ববাদ (তাওহিদ)। যা ইবরাহীম ও ইয়াকুব ﷺ তাঁদের সন্তানদের অনুসরণ

[১] পূর্ববর্তী যেসকল জাতি বিখ্যাত ধর্মবিশ্বাসের ধারক ছিল তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ কিভাবে বিকৃতি, পরিবর্তন এবং কখনো কখনো বিনাশের শিকার হয়েছে, তা ঐতিহাসিক দলিল এবং সেই ধর্মগুলোর পণ্ডিতদের সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোকে অধ্যয়ন করতে পারেন লেখকের গ্রন্থ 'আন-নুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়াহ ফী দ্বওইল কুরআন' এর সপ্তম আলোচনায়। এর মধ্যে পুরাতন ও নতুন বাইবেলসহ, ইরানের ধর্মগ্রন্থ "আভেস্তা" ও হিন্দুস্তানের "বেদ" এর পর্যালোচনাও রয়েছে।

করতে বলেছিলেন। এই আকীদার কারণেই প্রাচীনকালে ইহুদি জাতি অন্য জাতির তুলনায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদিরা প্রতিবেশী জাতিগুলোর অধীনে এসে অথবা বিজয়ী জাতির চাপে পড়ে তাদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানে শিরকি রীতিনীতি গ্রহণ করে। এই পরিবর্তনের বিষয়ে ইহুদি জাতির নীতিবান ঐতিহাসিকরাও একমত। যেমন, *Jewish Encyclopaedia*-তে এই বিষয়ে বলা হয়েছে :

> "নবিগণের মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রমাণ করে যে, ইসরাঈলীয়দের অন্তরে মূর্তি ও বহু দেবতার পূজা গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। ব্যাবিলনের বন্দিত্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিভিন্ন কুসংস্কার ও বহু দেবতার প্রতি বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল তারা। এমনকি তালমুদও[২] সাক্ষ্য দেয় যে, মূর্তিপূজার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল ইহুদিদের।"[৩]

ব্যাবিলনের *তালমুদ*-কে অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে ইহুদিরা। এমনকি অনেক সময় তারা এটিকে তাওরাতের চেয়েও বড় হিসেবে মনে করত। এটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এতে নানা অদ্ভুত উদাহরণ পাওয়া যায়—যা বুদ্ধির খর্বতা, অযথা কথাবার্তা, আল্লাহর প্রতি অবমাননা, সত্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্ম ও আকলের সঙ্গে তামাশায় টইটম্বুর। এ দ্বারা বোঝা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহুদি সমাজে মানসিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় বিকৃতি কতটা প্রকট ছিল।[৪]

☑ খ্রিষ্টধর্ম

খ্রিষ্টধর্মও বিভিন্ন ভ্রান্তি ও বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার হয়েছিল। অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা এবং রোমানদের পৌত্তলিকতার[৫] প্রভাবে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল খ্রিষ্টানরা। প্রথম যুগ থেকেই খ্রিষ্টধর্ম এসবের শিকার হয়। এর ফলে ঈসা ﷺ-এর সহজ ও স্বচ্ছ শিক্ষা আড়ালে চলে যায়। একসময় তাওহিদের আলো এবং আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ইবাদতের ধারা চাপা পড়ে যায় ঘন মেঘের আড়ালে।

একজন খ্রিষ্টান পণ্ডিত তার লেখায় দেখিয়েছেন, ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসটি কিভাবে খ্রিষ্টান সমাজে প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষ করে চতুর্থ শতকের শেষের দিকে। তিনি বলেন :

---

[২] "তালমুদ" শব্দের অর্থ হলো ইহুদি ধর্ম ও তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রন্থ। এটি 'মুশান্না' বা 'শরিয়া' নামক গ্রন্থের জন্য ইহুদি পণ্ডিতদের বিভিন্ন সময়কালের লিখিত ব্যাখ্যা, টীকা ও মন্তব্যের সংগ্রহ।

[৩] Jewish Encyclopedia,VOL. XII, p. 568-69

[৪] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: The Jew According to the Talmud - August Rohling। যেটি ড. ইউসুফ হান্না নাসরুল্লাহ 'আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়ায়িদিত তালমুদ' নামে আরবিতে অনুবাদ করেছেন।

[৫] William Drapper, Conflict Between Religion and Science, p. 40-41

> "ত্রিত্ববাদী ধারণার মানে হলো, এক ঈশ্বর তিনটি ব্যক্তিতে বিভক্ত। এটি খ্রিষ্টান বিশ্বের চিন্তা ও জীবনধারায় গভীরভাবে প্রবাহিত হতে থাকে চতুর্থ শতকের শেষদিকে। এবং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত অফিসিয়াল বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়, যা বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টান সমাজে ছিল বহুল চর্চিত। ত্রিত্ববাদী এই ধারণার প্রকৃত বিকাশ ও রহস্য কেবল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই প্রকাশিত হয়।"[৬]

একজন সমসাময়িক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক খ্রিষ্টান সমাজে পৌত্তলিকতার পুনরুত্থান সম্পর্কে বিভিন্ন আকারে এবং নানা রূপে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, খ্রিষ্টানরা বিভিন্ন প্রাচীন পৌত্তলিক জাতি ও ধর্ম থেকে আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল। এবং এটি কেবল প্রথাগতভাবে ও অজ্ঞতার কারণে ঘটেছিল। *The History of Christianity in the Light of Modern Knowledge* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আছে :

> "পৌত্তলিকতা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বরং তা ধীরে ধীরে গ্রহণ করা হচ্ছিল। একসময় যা পৌত্তলিক ধর্মে ছিল, তার প্রায় সবকিছু খ্রিষ্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলতে থাকে। যারা নিজেদের দেবতা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেনি, তারা অজান্তে নিজেদের ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদেরকে প্রাচীন দেবতাদের গুণাবলিতে রঞ্জিত করে। তাদের স্থানীয় প্রতিকৃতি বা মূর্তি তৈরি করে এবং তার নামকরণ করে। এর ফলে, কুফরি মতবাদ ও পৌরাণিক কাহিনিগুলো সেই শহীদদের নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এভাবেই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ওলি-আওলিয়াদের আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এসব ওলি-আওলিয়া একদিকে স্বর্গীয় মর্যাদায় অধিকারী মানুষের রূপ ধারণ করে, যারা আরাইউসীনদের ধারণা অনুসারে মানুষের এবং স্রষ্টার মাঝে ঐশ্বরিক সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। অন্যদিকে মধ্যযুগের পবিত্রতা ও সাধুতার প্রতীক হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠে। পৌত্তলিক হোলি এবং দেওয়ালি উৎসবের মতো আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করা হয়, যার নাম পালটে খ্রিষ্টধর্মের আচার হিসেবে পালন করা হতে থাকে। এমনকি ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সূর্য দেবতার পুরোনো উৎসবটি যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন হিসেবে পালিত হতে থাকে।"[৭]

ছয় শতকের শুরুতে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত শুরু হয়। সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে এটি একটি তীব্র যুদ্ধ—যা ছিল যিশুর প্রকৃতি ও সত্তা

[৬] The New Catholic Encyclopaedia. Vol. 14. p. 295; নিবন্ধ, তিন পবিত্রাত্মা, সংক্ষেপিত।
[৭] Rev. James Houston Bzxter; The History of Christianity. P. 704

নিয়ে তর্কের ফলস্বরূপ। এই বিরোধের কারণে মঠ, গির্জা ও বাড়িঘরগুলো আঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। একপক্ষ অপরপক্ষকে কাফির বলে অপবাদ দেয়। একে অপরকে হত্যা করতে থাকে নির্মমভাবে। এটা যেন দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বা দুটি শত্রু জাতির মধ্যে যুদ্ধ! ফলস্বরূপ, খ্রিষ্টান বিশ্ব নিজেদের মধ্যকার বিরোধিতা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[৮] মানবতার কল্যাণ এবং বিশ্বের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয় তারা।

☑ মাজুস

মাজুসরা প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতি-পূজারি ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আগুন। তারা বিশেষভাবে এটির পূজা শুরু করেছিল। এর জন্য তারা নির্মাণ করল মন্দির ও উপাসনালয়। এই অগ্নি-মন্দিরগুলো ছড়িয়ে পড়ল দেশজুড়ে। তাদের কাছে পূজা-অর্চনার খুবই সুসংগঠিত নিয়ম-কানুন ছিল, যা অনুসরণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। অগ্নিপূজা এবং সূর্যকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করার পাশাপাশি, অন্যসব ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শন সেখানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে ধর্ম ছিল নির্দিষ্ট স্থানে পালনীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা মাত্র। কিন্তু এর বাইরে ধর্মের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। উপাসনালয়ের বাইরে তারা ছিল ঈশ্বর থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। যেখানে তারা নিজেদের মনমতো জীবন যাপন করত। মাজুসরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, কাজকর্ম এবং রীতিনীতিতে তাদের সাথে ধর্মবিমুখদের আর কোনো পার্থক্য ছিল না।[৯]

ড্যানিশ লেখক অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টেনসেন সাসানিয়ান যুগের ধর্মীয় প্রধানদের শ্রেণি এবং কাজকর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> "এই ধর্মীয় কর্মকর্তাদের জন্য দিনে চার বার সূর্যপূজা করা বাধ্যতামূলক ছিল। তদুপরি, তাদের চাঁদ, আগুন এবং পানির পূজাও করতে হতো। তাদের কিছু বিশেষ মন্ত্র ছিল, যা তারা রাতে ঘুমাবার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, গোসল করার সময়, কাপড় পরার সময়, খাওয়ার সময়, হাঁচি দেওয়ার সময়, চুল কাটা, নখ কাটা এবং মল-মূত্রত্যাগের সময় পড়তে বাধ্য ছিল। এ ছাড়া, তারা নির্দেশিত ছিল যাতে আগুন নিভে না যায়। আগুন ও পানি একে অপরকে স্পর্শ না করে। ধাতু ধূসর না হয়। কারণ তাদের কাছে ধাতু ছিল পবিত্র।"[১০]

---

[৮] দেখুন: The Arab conquest of Egypt (আরবদের মিসর বিজয়) গ্রন্থটি, যা আলফ্রেড বাটলার রচনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ ফরিদ আবু হাদিদ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। পৃষ্ঠা. ৩৭, ৩৮, ৪৭।

[৯] বিস্তারিত দেখুন: ১. ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যিন, আর্থার ক্রিস্টেনসেন, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইরানের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। ২. তারিখে ইরান, শাহীন ম্যাকারিয়স, মাজুসী ইতিহাসবিদ।।

[১০] ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যিন, পৃ. ১৫৫

এ ছাড়া, ইরানের লোকেরা তাদের প্রার্থনায় আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়াত। সাসানীয় রাজবংশের শেষ রাজা ইয়াজদগার্দ একবার সূর্যের নাম নিয়ে শপথ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি শপথ নিচ্ছি সূর্যের—যেটি সর্বোচ্চ দেবতা।" খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগকারী তাওবাকারীরা নিজেদের সততা প্রমাণের জন্য সূর্য পূজা করতে বাধ্য ছিল।[১১]

তারা প্রতিটি যুগে দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং এটি তাদের মূল চিন্তা-ধারা হয়ে উঠেছিল। তারা দুটি দেবতায় বিশ্বাস করত। একটি আলো বা ভালোবাসার দেবতা—যাকে তারা 'আহুরা মজদা' বা 'ইজদান' নামে পরিচিত করত। আরেকটি অন্ধকার বা খারাপের দেবতা—যাকে 'আহরিমান' বলা হতো। এই দুটি দেবতার মধ্যে লড়াই এখনো অব্যাহত এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ চিরকালীন—এটা তাদের বিশ্বাস।[১২]

ইরানি ধর্মের ইতিহাসবিদরা বহু পৌরাণিক কাহিনি উল্লেখ করেন, যা দেবতাদের সম্পর্কে অনেক বৈচিত্র্যময় এবং বিশদ। এটা গ্রিক বা হিন্দু মিথোলজির মতোই আশ্চর্যজনক ও বিস্তৃত।[১৩]

☑ বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুস্তানের পাশাপাশি মধ্য এশিয়াতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়। এটি যেখানে-সেখানে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে দিতে থাকে। মন্দির নির্মাণ এবং বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন একটি সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায় বৌদ্ধদের কাছে। যে জায়গাতেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, সেখানেই গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে মন্দির।[১৪]

জ্ঞানীরা এখনো সন্দিহান—বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম পৃথিবী, আকাশ ও মানবতার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিশ্বাসের ওপর অবিচল ছিলেন কি না। তারা এ বিষয়ে সঠিক প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছেন না এবং এ বিশাল ধর্ম কিভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়াই গড়ে উঠল, সে প্রশ্নেও তারা হতভম্ব।[১৫]

☑ ব্রাহ্মণ্যধর্ম

ব্রাহ্মণ্যধর্ম হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস হিসেবে পরিচিত। অসংখ্য দেব-দেবী

---

[১১] ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যিন, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

[১২] ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যিন, পৃ. ১৮৩-২৩৩

[১৩] ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যিন, পৃ. ২০৪-২০৯।

[১৪] দেখুন: ১. প্রাচীন হিন্দুস্তান, লেখক: ঈশ্বরী টোপা, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্তানীয় সভ্যতা ইতিহাসের অধ্যাপক। ২. দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা. ২০১-২০২।

[১৫] দেখুন: ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার বৌদ্ধ ধর্মের ওপর লিখিত নিবন্ধ।

এবং পূজনীয় বস্তুর জন্য এই ধর্ম বিখ্যাত। ষষ্ঠ শতকে পৌত্তলিকতা এখানে এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, দেব-দেবীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৩ কোটি।[১৬] এই সময়ে যা কিছু মহৎ, যা কিছু বিশাল এবং যা কিছু উপকারী, সবকিছুই পূজার উপযুক্ত দেবতা হিসেবে বিবেচিত হতো। এই সময়ে মূর্তি নির্মাণ শিল্পও উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। শিল্পীরা মূর্তিগুলোকে আরও মনোমুগ্ধকর করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

হিন্দুস্তানীয় পণ্ডিত অধ্যাপক সি. ভি. বৈদ্য তার *মধ্যযুগের হিন্দুস্তানের ইতিহাস* গ্রন্থে সম্রাট হরিশ (৬০৬-৬৪৮ খ্রি.)-এর যুগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৈদ্য বলেছেন :

> "হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মই ছিল পৌত্তলিক। বরং বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের চেয়েও অধিক পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল। যদিও বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হয়েছিল আল্লাহকে অস্বীকারের মাধ্যমে, তবে কালের পরিক্রমায় বুদ্ধকেই সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে পূজা করা হতে থাকে। পাশাপাশি বোধিসত্ত্বের মতো আরও অনেক দেবতাকেও যুক্ত করা হয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ দর্শনের 'মহাযান' শাখায় পৌত্তলিকতা ব্যাপকভাবে জায়গা করে নেয়। হিন্দুস্তানে তা এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয় যে, এমনকি কিছু প্রাচ্য ভাষায় 'বুদ্ধ' শব্দটি 'মূর্তি' বা 'প্রতিমা'র সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।"[১৭]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে তখন ছিল পৌত্তলিকতার ব্যাপক প্রচলন। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব যেন মূর্তিপূজার গভীর সাগরে ডুবন্ত ছিল। তেমনিভাবে খ্রিষ্টধর্ম, সেমেটিক ধর্মমত এবং বৌদ্ধধর্মও মূর্তি আর দেবতাদের প্রতি সমর্পণ ও সম্মান প্রদর্শনে যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। এদের এই কার্যক্রম যেন একটি ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মতোই চলছিল।[১৮]

একজন বিদগ্ধ হিন্দু পণ্ডিত তার *Popular Hinduism the Religion of the Masses* নামে একটি গ্রন্থে বলেছেন,

> 'দেবতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া' তখনো শেষ হয়নি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতারা যুক্ত হতে থাকে এই বিশাল 'দেবসমাজ'-এ। যা একপর্যায়ে

[১৬] Romesh Chunder Dutt, Ancient India, Vol. 3, p. 276; L.S.S. O Malley, Popular Hinduism the Religion of the Masses, p. 6-7

[১৭] যেমন ফার্সি ভাষা এবং এর শাখা ভাষাগুলোর মধ্যে উর্দু একটি, যেখানে "মূর্তি" বা "প্রতিমা" বোঝাতে "বুত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটি ইরান ও হিন্দুস্তানের সাহিত্যে, কবিতায় এবং সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় বহুল প্রচলিত। হিন্দুস্তানে মানুষ বুদ্ধকে "বুত" বলে অভিহিত করে এবং "গৌতম বুদ্ধ" বলতে তারা "গৌতম বুত" বলে উল্লেখ করে। এখানে "বুত" এবং "বুদ্ধ" শব্দ দুটি উচ্চারণের দিক থেকে খুবই মিল রয়েছে।

[১৮] C.V.Vaidya:History of Mediaeval Hindu India, Vol, I) Poona, 1921, p. 101.

সংখ্যায় এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তা গুনে শেষ করা কঠিন। অনেক দেবতা ছিল প্রাচীন হিন্দুস্তানীয়দের স্থানীয় দেবতা, যাদের হিন্দুধর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বলা হয়, এই দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ কোটিতে পৌঁছেছিল।[১৯]

☑ আরবদের অজ্ঞতার যুগ

প্রাচীন যুগে আরবরা ইবরাহীম ﷺ-এর দ্বীনের অনুসারী ছিল এবং তাদেরই ভূমিতে আল্লাহর প্রথম ঘর নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু নবিদের যুগ থেকে দীর্ঘ সময়ের দূরত্ব এবং আরব উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে তারা এমন এক গভীর পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়েছিল, যার তুলনা কেবল হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সঙ্গেই করা যায়। শিরক ও মূর্তিপূজায় তারা এতটাই ডুবে ছিল যে, এক আল্লাহকে ছেড়ে তারা বহু ইলাহের উপাসনায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। নিজেদের বানানো দেবতাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনায় শরিক করত। এদের কাছে কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতির মালিকানা, এমনকি জীবন ও মৃত্যুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করত। পুরো আরব সমাজ পৌত্তলিকতার সাগরে ডুবে ছিল। প্রতিটি গোত্র এবং এলাকায় ছিল আলাদা আলাদা দেবতা। বলা যায়, আরবের প্রতিটি ঘর একেকটি মন্দিরে পরিণত হয়েছিল।[২০]

কাবা শরিফকে ইবরাহীম ﷺ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যই নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এর আঙিনায় তারা রেখেছিল তিনশ ষাটটি মূর্তি।[২১] ধীরে ধীরে তারা মূর্তিপূজার পাশাপাশি পাথরপূজায়ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের দেবতাদের মধ্যে ছিল ফেরেশতা, জিন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী। তারা বিশ্বাস করত ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, আর জিনেরা আল্লাহর অংশীদার। এদের শক্তি ও প্রভাবের ওপর তারা এমনভাবে আস্থা স্থাপন করেছিল যে, তাদের ইবাদত করাই যেন স্বাভাবিক ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২২]

ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেশ ও জাতির চিত্র

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। যেসব ধর্ম মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাত, সেগুলো সেই যুগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু যেসব অঞ্চলে সমৃদ্ধ সরকারব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির

---

[১৯] L.S.S.O Malley, Popular Hinduism, the Religion of the Masses. p.6-7.

[২০] পড়ুন, হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ আল কালবী, কিতাবুল আছনাম, পৃষ্ঠা. ৩৩।

[২১] সহীহ বুখারী, হাদিস : ৪২৮৭, ৩৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদিস : ১৭৮১; জামিউত তিরমিযি, হাদিস : ৩১৩৮; সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ২০২৭।

[২২] কিতাবুল আছনাম: পৃ. ৪৪।

প্রসার ঘটেছিল, সেখানে ধর্মগুলো মূল চেহারা হারিয়ে ফেলেছিল। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার মৌলিক শক্তি। সংস্কারকরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষক ও দিকনির্দেশকদের অনুপস্থিতি ছিল স্পষ্ট।

☑ প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য

প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যে[২৩] কর ও শুল্কের বোঝা ক্রমেই বাড়িয়ে চলছিল। জনগণের ওপর তা এতটাই চাপে পরিণত হয়েছিল যে, তারা তাদের শাসকদের চেয়ে বিদেশি শাসকদেরই প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল। একের পর এক দাঙ্গা ও বিদ্রোহ অশান্তি বাড়িয়েই চলছিল। ৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম জাস্টিন-এর আমলে কনস্টান্টিনোপলের এক বিপর্যয়ে ত্রিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।[২৪]

তখনকার মানুষদের প্রধান উদ্বেগ ছিল কেবলই সম্পদ অর্জন। অর্থ যেখান থেকেই আসুক, তা ব্যয় হতো বিলাসিতায়। তাদের বিনোদনের পন্থাগুলো চরম নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

Civilization Past and Present গ্রন্থে বাইজেন্টাইন সমাজের অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা ও বিলাসী জীবনের এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে লেখকগণ লিখেছেন :

> "বাইজেন্টাইনদের সামাজিক জীবনে বিরাট এক বৈপরীত্য ছিল। তাদের মনে ধর্মীয় প্রবণতা গভীরভাবে প্রোথিত, সন্ন্যাসব্রত সমাজজুড়ে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, আর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত গভীর ধর্মীয় আলোচনায় যুক্ত থাকত। বাইজেন্টাইনদের সনাতন তর্কে মগ্ন থাকত। এইসব বিষয়েই তাদের ব্যস্ততা দেখা যেত।"

সাধারণ জীবন একদিকে সন্ন্যাসী মতবাদে প্রভাবিত ছিল, অন্যদিকে সেখানে ছিল মাত্রাতিরিক্ত বিনোদন, খেলাধুলা, মজা ও বিলাসিতা। সার্কাসের বিশাল খেলার মাঠে আসন ছিল ৮০ হাজার। এখানে তারা দেখত পুরুষদের মধ্যে লড়াই। কখনো লড়াই হতো পুরুষ এবং বাঘের মধ্যে।

ক্রীড়াগুলোকে তারা দুটি দলে বিভক্ত করত : একদল নীল, অন্যদল সবুজ। তারা সুন্দর ও সুন্দরীকে পছন্দ করত। তবে পাশাপাশি সহিংসতা ও নৃশংসতাকেও আকর্ষণ করত। তাদের খেলাধুলা ছিল রক্তাক্ত, নিষ্ঠুর। অধিকাংশ সময়ে বর্বর

---

[২৩] 'বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য' নামে পরিচিত এবং আরবদের কাছে 'রোম' নামে অভিহিত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, সেই যুগে গ্রিস, বলকান, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের সূচনা আর ১৪৫৩ সালে উসমানীয়রা কনস্টান্টিনোপল দখলের মধ্য দিয়ে এর পতন ঘটে

[২৪] Historian's History of The World. Vol.VII p. 73.

যুদ্ধের মতো। তাদের শাস্তি ছিল ভয়ানক, যা শুনলেই শরীর শিউরে ওঠে।[২৫]

তাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী মানুষদের জীবন ছিল এক ধরনের অবাধ মজমাস্তি ও বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। তারা একদিকে যেমন নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠত, তেমনই মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা দেখানোর চেষ্টাও করত। এর পাশাপাশি তাদের জীবনে ছিল নানান বদ অভ্যাস এবং অশোভন কাজকর্ম, যা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।[২৬]

প্রাচুর্যের অধিকারী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল মিসর। তা ছিল ভীষণ ধর্মীয় নিপীড়ন ও চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। পাশাপাশি, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির এক বিশাল উৎসও ছিল এটি। তবে সে সমৃদ্ধি থেকে আহরিত হতো খুবই স্বল্প। একে এমন একটি গাভির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যাকে দুধ দানের জন্য ভালোভাবে পোষণ করা হয়, কিন্তু খাদ্য দেওয়া হয় অতি সামান্য।[২৭]

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রদেশ ছিল সিরিয়া। এখানে রোমানদের সম্প্রসারণমুখী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলস্বরূপ শাসনব্যবস্থা কেবল শক্তির মাধ্যমে চলত। যেখানে শাসিত জনগণ কখনোই স্নেহ বা ভালোবাসার ছোঁয়া পেত না। এমন দারিদ্র্যের অবস্থা ছিল যে, অনেক সিরীয় পরিবার তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য সন্তানদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য হতো। বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, অধিকারহরণ, মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং জনগণকে বিনামূল্যে শ্রম দিতে বাধ্য করা ছিল সাধারণ একটি প্রথা।[২৮]

☑ পারস্যের সাসানী সাম্রাজ্য

পুরোনো ইরানে প্রধান ধর্ম ছিল জরথ্রুস্টবাদ ধর্ম, যা মজদীয় ধর্ম হিসেবেও পরিচিত। ধারণা করা হয় যে, 'জরথ্রুস্ট' নামে পরিচিত এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তম শতাব্দীর আগে আবির্ভূত হন। এই ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল আলো ও অন্ধকার, ভালো ও মন্দ, ভালোর ঈশ্বর ও মন্দের ঈশ্বরের মধ্যে অবিরাম চলা এক সংগ্রাম।

তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'মানি' এই ধর্মের পুনর্গঠন করেন এবং এতে কিছু নতুন উপাদান যুক্ত করেন। তিনি 'শাহপুর' নামে এক রাজাকে তার অনুগামী হিসেবে পেয়েছিলেন, যিনি আরডশির (২৪১ খ্রিষ্টাব্দ) পর সাসানীয়[২৯] সাম্রাজ্যের

---

[২৫] Edward Gibbon, The Decline and Fall of Roman Empire. p. 3-5

[২৬] S. T. Walter and Alastair M. Taylor, Civilization Past and Present, P. 261-62.

[২৭] The Arab conquest of Egypt; Historian's History of the world. Vol. 7.

[২৮] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: উসতায কুর্দ আলি, খুতাতুশ শাম, ১/১০১।

[২৯] সাসানী সাম্রাজ্য আয়তন, ঐশ্বর্য এবং ধন-সম্পদের দিক দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের (যা বৃহৎ রোমান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত) চেয়ে বৃহত্তর ছিল। এটি ২২৪ খ্রিস্টাব্দে